ব্রিকস কতটা বিকল্প অর্থনীতির কথা বলে

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ব্রিকসের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ কখনোই লুকিয়ে রাখেননি। গত বছর তিনি হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, যেসব দেশ ব্রিকসের তথাকথিত "আমেরিকাবিরোধী নীতি'র সঙ্গে যুক্ত হবে, তাদের ওপর ১০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা হবে। এর পর থেকে তাঁর প্রশাসন জোটের সদস্য দেশ যেমন ব্রাজিল, ভারত ও চীনের মতো বাণিজ্যিক অংশীদারের বিরুদ্ধে শুল্ককে আগ্রাসী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে আসছে।

বার্তাটি একদম পরিষ্কার। যেসব দেশ মার্কিন অর্থনৈতিক শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করবে, তাদের মূল্য চুকাতে হবে। কিন্তু জোরজবরদস্তির একটা পরিণতি থাকে। আজ যখন ব্রিকস নেতারা নয়াদিল্লিতে বৈঠকে বসছেন, তখন ট্রাম্প হয়তো সেই প্রণোদনাগুলোই আরও শক্তিশালী করে তুলছেন, যা শুরুতে এই জোটকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। ওয়াশিংটন যত বেশি মার্কিন বাজার, নিজস্ব আর্থিক ব্যবস্থা এবং ডলারকে রাজনৈতিক চাপের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার মনোভাব দেখাবে, অন্যান্য দেশের জন্য এগুলোর ওপর নিজেদের নির্ভরতা কমানোর কারণ তত জোরালো হবে।

এর অর্থ এই নয় যে, ব্রিকস একটি আমেরিকাবিরোধী জোটে পরিণত হচ্ছে। বিষয়টি মোটেও তেমন নয়। জোটের ১১টি সদস্য দেশ—ব্রাজিল, চীন, মিসর, ইথিওপিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, রাশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে ব্যাপক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতপার্থক্য রয়েছে। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক এবং বৈশ্বিক মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন-জিডিপির প্রায় ৪০ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করলেও তাদের নির্দিষ্ট কোনো একক মতাদর্শ, নিরাপত্তা নীতি বা এমনকি ভূ-রাজনৈতিক লক্ষ্যও নেই।

সাম্প্রতিক সময়ের ঘটনাপ্রবাহ এই বিভাজনগুলোকে পুরোপুরি স্পষ্ট করে দিয়েছে। আঞ্চলিক সংঘাত বাড়ার কারণে ইরান, সৌদি আরব এবং আরব আমিরাত এখন একে অপরের মুখোমুখি। মে মাসে নয়াদিল্লিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের একটি বৈঠকে ইরান ও আমিরাতের প্রতিনিধিরা বাগ্বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। অন্যদিকে ভারত ও চীনের মধ্যে একটি উত্তপ্ত সীমান্ত বিরোধ রয়েছে, যা ২০২০-২১ সালে প্রাণঘাতী সংঘর্ষে রূপ নিয়েছিল; কেবল বিগত দুই বছরেই তাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ধীরে ধীরে স্থিতিশীল হয়েছে। কাজেই ওয়াশিংটনের বিরুদ্ধে ট্রাম্প কোনো একক ভূ-রাজনৈতিক ফ্রন্ট তৈরিতে ইন্ধন দিচ্ছেন না।

তিনি ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের দেশগুলোকে একটি সাধারণ উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিকভাবে পরস্পরকে সহযোগিতা করার সুযোগ করে দিতে পারেন। আর তা হলো মার্কিন ক্ষমতার ঝুঁকি থেকে নিজেদের রক্ষা করা।

পশ্চিমা বলয়ের বাইরের দেশগুলোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল হওয়াটা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। ডলারের কেন্দ্রীয় অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রকে বিশাল এক কাঠামোগত সুবিধা দেয়। আন্তর্জাতিক লেনদেনগুলো মার্কিন এখতিয়ারের অধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হয়। মার্কিন বাজারে প্রবেশাধিকার সংকুচিত

করা সম্ভব; এমনকি নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে সরকার বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বড় অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যায়।

ব্রিকসকে ফের একটি আমেরিকাবিরোধী হুমকি হিসেবে তুলে ধরা ওয়াশিংটনের জন্য হিতে বিপরীত হতে পারে। বিকল্প খোঁজার কারণে দেশগুলোকে শাস্তি দিলে সেটি তাদের বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলার আরও একটি শক্ত কারণ তৈরি করে দেয়।

মার্কিন আর্থিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভরতা কমানোর ব্রিকসের এই চেষ্টার মানে কিন্তু এটা নয়, আন্তর্জাতিক সংরক্ষিত মুদ্রা বা রিজার্ভ কারেন্সি হিসেবে ডলারকে সরিয়ে দেবে। ব্রিকস সম্মেলনগুলোর আশপাশে প্রায়ই এ ধরনের দাবি উঠতে দেখা যায়, যার সঙ্গে সাধারণত ব্রিকসের নতুন এক মুদ্রা আসার মুখরোচক ভবিষ্যদ্বাণী জুড়ে দেওয়া হয়। তবে বাস্তব তথ্যপ্রমাণ এই দাবিকে সমর্থন করে না।

ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে জ্বালানি কেনা এবং ব্রিকসের ভেতরে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়ানোর পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও সুসম্পর্ক বজায় রাখছে। ব্রাজিলও চীনের অনুগত না হয়ে দীর্ঘকাল নিজস্ব স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখতে চেয়েছে। অন্যদিকে সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত চীনের সঙ্গে সম্পর্ক বিস্তার করলেও পশ্চিমা অর্থনীতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। তাদের মূল উদ্দেশ্য সম্ভবত এক পরাশক্তিকে সরিয়ে আরেক পরাশক্তিকে বসানো নয়, বরং প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিকেন্দ্রগুলোর মাঝে নিজেদের সুবিধাজনক অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা বাড়ানো।

এই পার্থক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রুপিতে নিষ্পত্তিকৃত কোনো বাণিজ্য লেনদেন, চীনা কারেন্সি “রেনমিনবি” বা দক্ষিণ আফ্রিকার “রেন্ড” নেওয়া কোনো ঋণ কিংবা পশ্চিমা মধ্যস্থতাকারীদের ওপর নির্ভর না করা কোনো ব্যবস্থার মাধ্যমে লেনদেন—একাই ডলারের একচ্ছত্র আধিপত্যকে ভেঙে ফেলবে না। কিন্তু এই ধরনের বন্দোবস্ত যদি বিভিন্ন দেশে এবং দীর্ঘ সময় ধরে ছড়িয়ে পড়ে, তবে তা ওয়াশিংটনকে “না” বলার শক্তি ও সক্ষমতা বাড়িয়ে দেবে।

এ কারণে ব্রিকসকে স্রেফ একটি আমেরিকাবিরোধী হুমকি হিসেবে তুলে ধরা ওয়াশিংটনের জন্য হিতে বিপরীত হতে পারে। বিকল্প খোঁজার কারণে দেশগুলোকে শাস্তি দিলে সেটি তাদের বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলার আরও একটি শক্ত কারণ তৈরি করে দেয়। ট্রাম্প হয়তো মার্কিন ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করা ব্যয়বহুল করতে চেয়েছেন; কিন্তু তার বদলে তিনি মার্কিন ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল থাকাটাকে আরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ও ব্যয়বহুল করে তুলছেন।

■ **ইলান কাপুর:** টরন্টোর ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি অব এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড আরবান চেঞ্জ-এর ক্রিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক